# ‘‘কবিদের চোখ থাকে বুকে’’ দিব্যেন্দু পালিতের কবিতা

অংশুমান কর



পংক্তি নির্ভর কিছু কবিতা আছে পৃথিবীর সব দেশের সাহিত্যেই। বিদ্যুৎ চমকের মতো সারা আকাশ আলোয় ভরে দেওয়া পংক্তি। এমনই তার দ্যুতি, এমনই তার ঐর্ষ যে কবিতার শরীর থেকে পৃথক হয়েও সে বেঁচে থাকে। রাস্তায় ভিড়ের মধ্যেই হঁাটতে থাকে মানুষের মাথায়, একলা জানলার পাশটিতে বসা দুঃখীর মনে তার বারবার আসা - যাওয়া এরকম স্মরণযোগ্য পংক্তি, কবিতার মূল শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এক সময় যে জননীকে অগ্রাহ্য করার সাহস দেখায় সেরকম পংক্তি, দিব্যেন্দু পালিত সারা জীবনে খুব বেশি লেখেননি। তাঁর পথ আলাদা। পংক্তি নয়, একটি পূর্ণ কবিতাই লিখতে চান তিনি। শব্দ কুঁদে কুঁদে তৈরি করতে চান এমন এক ভাস্কর্য যা শেষ হওয়ার পর চোখে পড়ে তার ঐর্য। দিব্যেন্দুর সমসাময়িক পঞ্চাশের অনেক কবিরই একাধিক স্মরণযোগ্য পংক্তি পাঠকের মুখেমুখে ফেরে। দিব্যেন্দুর গুটি কয়েক। এখানেই তাঁর বিশিষ্টতা, এখানেই তিনি অন্য অনেকের চেয়ে পৃথক। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘রাজারবাড়ি অনেক দূরে’ থেকে শেষতম প্রকাশিত বই ‘সতর্কবার্তা’ পর্যন্ত দিব্যেন্দুর যে পরিক্রমা তা যে সর্ব অর্থে ধারাবাহিক এবং সংলগ্ন তেমনটা হয়তো নয়, কিন্তু এই একটি জায়গায় দিব্যেন্দু তুষ্ট থেকেছেন তাঁর লেখালেখির পঞ্চাশ বছর ধরে। তিনি সেই কবি নন যিনি দামি মার্সিডিজে চড়িয়ে পাঠককে দেখাতে থাকেন শহরজোড়া হর্ম্যের সৌকর্য; তিনি একলা পাঠকের পিঠে হাত রেখে তাকে নিয়ে আসেনটিমটিমে আলো জ্বলা স স গলিতে, দেখান সেই জীবন যা পাঠকের চিরকালের চেনা অথচ ওই অল্প আলোয় ভীষণ অচেনা লাগে।মন ভরে ওঠে না দেখাকে দেখার আনন্দে।

কবি জীবনের শুতে, অন্য অনেকের মতোই, দিব্যেন্দু পালিতের কবিতা ছিল কনফেশনাল পোয়েট্রির বাংলা কবিতার স্রোতে ভাসমান অনেক নৌকোর একটি। নিজেকে নিয়ে লেখা অধিকাংশ কবিতা। আলগাভাবে ‘রোমান্টিক’ শব্দটি সেঁটে যেতে পারে যেসবকবিতার গায়ে সেরকম। ত্রমশ নিজের অভিজ্ঞতা, অনুভূতির সঙ্গেই দিব্যেন্দু পালিতের কবিতা ধারণ করতে থাকলে চরিত্রের মিছিল, চারপাশের চেনা মানুষের ছোটখাট সুখদুঃখ---কবি ও ঔপন্যাসিক দিব্যেন্দু পালিতের মধ্যে যাতায়াতের পথ প্রশস্ত ও সুগম হল। কবিতাহয়ে উঠল বত্র, স্ফটিকের মতো তা বিচ্ছুরিত হতে থাকল ত্রোধ, ঘৃণা, হতাশা আর ক্লেদের ওপরেও। তাঁর নিজের ভাষায়

... আমার গোড়ার দিকের কিছু, কবিতায় রোমান্টিকতার স্পর্শ আছে। ‘রাজার বাড়ি অনেক দূরে’, ‘আহত অর্জুন’, ‘কিছু স্মৃতি কিছু অপমান’ ---এই প্রথম তিনটি কবিতার বইয়ে আছে তার নিদর্শন। কিন্তু, এগুলিও নিতান্তই প্রক্ষিপ্ত। আমার কবিতার মূল সুর নয়। দুঃখ, বিষাদ, বিমূর্ততা, অসহায়তা, মৃত্যুভাবনা, ব্যঙ্গ, বত্রোক্তি--- আমি জানি না, কেন এমন হল, এমনই হল!

(মল্লিকা সেনগুপ্তের নেওয়া সাক্ষাৎকার, কৃত্তিবাস, জুলাই - সেপ্টেম্বর ২০০৪) কেমন লিখতেন প্রথম যৌবনের সেই দিব্যেন্দু? রোমান্টিকতার স্পর্শ তো ছিলই, কিন্তু পরবর্তী সময়ে কোন দিকে বাঁক নেবে তাঁর কবিতা তার স্বাক্ষরও ছিল স্পষ্ট। সেই অর্থে, দিব্যেন্দু পালিতের কবিতা, ইংরেজিতে যাকে বলে ‘র‍্যাডিকালি’ সেভাবে পাল্টায়নি। তাঁর পরিবর্তন ভীষণ ধারাবাহিক ও সুসংলগ্ন হয়তোনয়, আবার পুরনো লেখার সঙ্গে একেবারে যোগসূত্রহীন নয় নতুন দিব্যেন্দুর লেখা। একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যায় কোথায় রয়েছেসেই সুতো যা দর্শকের চোখে হয়তো পড়েনি, কিন্তু পুতুল নাচিয়ে আর

পুতুলের অনিবার্য সংযোগের কাজটি করছে আপাত অদৃশ্য থেকে। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থের (যে গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি দেখে দিয়েছিলেন দিব্যেন্দুর শিক্ষক অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত) নাম কবিতাটি যেমন। শুরুচ্ছে জীবনকে ভালবেসে। একটা জার্নি। কবি নিশ্চিত ভালবাসায় ভর করে পৌঁছনো যাবেই গন্তব্যে, পাওয়া যাবে অভীপ্সা

রাজার বাড়ি অনেক দূরে। তুমি
পথ দেখালে যেতে পারি।
সকালে হোক, বিকালে হোক
রাত্রিবেলা----
নিভলে আলো, হলুদ সবুজ থাম পেরিয়ে;
হাওয়ার থেকে পথের মতো
আনতে পারিশ্বাস---
সকালে হোক, বিকালে হোক;
শুধু তোমার ইচ্ছা যদি থাকে।

এরই নাম অপটিমিজ্‌ম, আশাবাদ। শুধু চোখ আটকে যায় দিব্যেন্দুর যতিচিহ্নের ব্যবহারে। তিনটি পূর্ণ যতি, চারটি কমা, দুটি ড্যাশ, দুটি সেমিকোলন। থামছেন দিব্যেন্দু। ঝড়ের মতো হু হু করে কবিতা আসছে না। আসলেও, তিনি তাকে নিয়ন্ত্রণ করছেন। করছেন। কেন? সম্ভবত দ্বিধা আছে গন্তব্য নিয়ে, অজানা এক ভয়। যা তাকে থমকে থমকে দিচ্ছে। কবিতাটির শেষ স্তবক

কিন্তু ভয়  সত্যি কিছু আছে না কি!
দুরন্ত দিন, ফলন্ত মাঠ?
যাকে পাবার ইচ্ছা ছিলো?
জানি না তা। এখন শুধু
তৃষ্ণা, আমার
রক্ত; এবং তরল আঁধার---
নেমে আসছে, নেমে যাচ্ছি হঠাৎ যেন
সিঁড়ির গাঢ় অন্ধকারে,
তবু---
নিঃস্ব হবার আগে যেন শান্ত হতে পারি।

তীব্র ইচ্ছার মুদ্রা প্রলোভন দেখায়। কিন্তু মুদ্রার অন্যপিঠটি অজানা। অন্ধকার। আর কী সহজ তাঁর উপমা ব্যবহার! কেমন সেই অন্ধকার? না, সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাওয়ার সময় যে অন্ধকার ওঁৎ পেতে থাকে প্রতি ধাপে, তেমন। সেই রবীন্দ্রনাথের 'হারিয়ে যাওয়া' থেকে সিঁড়ি অন্ধকারের, আতঙ্কের, অবনমনের সমার্থক হয়ে উঠেছে বাংলা কবিতায়। কী চমৎকারভাবে এই বহু ব্যবহৃত প্রতীকটিকেই ব্যবহার করে নেন দিব্যেন্দু! আমরা বুঝতে পারি সিঁড়ির গাঢ় অন্ধকারের মুখ একবার দেখে ফেলেছেন, যিনি, তিনি আর কোনওমতেই পুরোপুরি মুক্ত হতে পারবেন না অন্ধকারের অমোঘ আকর্ষণ থেকে। যদিও, মনে রাখতে হবে, কবিতাটি দিব্যেন্দু শেষ করেন 'নিঃস্ব হবার আগে যেমন শান্ত হতে পারি' এই পংক্তি দিয়ে। আসলে একটা দোলাচলের মধ্যে কিছুক্ষণ খেলে তারপর নিজের বিশ্বাস জানান তিনি। উৎকণ্ঠাহীন, সাবলীল যাত্রা তাঁর পছন্দ নয়। 'আহত অর্জুন' কাব্যগ্রন্থে 'আমি শব্দ শব্দহীন' কবিতাটিতে এভাবে সেই অপছন্দেরকথা জানালেন দিব্যেন্দু

এতো সাবলীল যাত্রা ভালো নয়, কিঞ্চিৎ ভয়ের
অরণ্য সামনে রেখো --- চেকপোস্ট, রক্তিম ট্রাফিক---
যেখানে গভীর অব্দি ডুব দিয়ে ছোঁয়া যাবে উদ্‌গ্রীব সততা।
না হ'লে প্রবঞ্চক শব্দগুলি থেকে যাবে পাপবিদ্ধ কিন্তু লিঙ্গহীন
পোকার উপমা নিয়ে দেয়ালির রাত্রিশেষে মৃত।

সম্ভবত তাই দিব্যেন্দুর কবিতায় এত যতিচিহ্ন, এত সেমিকোলন,। ওরাই তার চেকপোস্ট, রক্তিম ট্রাফিক। জীবনানন্দের পরবর্তী সময়ে আরও কোন কবি এত সেমিকোলন ব্যবহার করেছেন কি? দিব্যেন্দুর মতো?

কৃত্তিবাস পত্রিকাতেই সেই সাক্ষাৎকারে মল্লিকা সেনগুপ্ত দিব্যেন্দু পালিতকে জিজ্ঞাসা করেন, "দিব্যেন্দুদা, আপনি কীরকম কবিতা পড়তে ভালবাসেন? যে কোন ভাল কবিতা না, কোনো বিশেষ ধরনের কবিতা? " দিব্যেন্দু পালিতের উত্তর
যে কবিতায় রহস্য আছে, বোধক ও অনুভূতির সূক্ষ্মতা আছে, শব্দ ব্যবহার, ছন্দ ও বিন্যাসে আছে অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্য, যা প্রথম পাঠেই শেষ হয় না, আকর্ষণ করে পুনঃপাঠে--- সেই ধরনের কবিতাই আমার পছন্দ। বা, যে কবিতা গভীর জীবন, বাস্তব, সমসাময়িক ইতিহাসকে স্পর্শ করে গড়ে ওঠে, নাড়া দেয়, সেরকম কবিতাও আমরা পছন্দ। ঠিকই তো, কবিতা অনেক রকমের।
সময় যত এগিয়েছে কবি দিব্যেন্দু পালিত দ্বিতীয় ধরনের কবিতার দিকে যেন একটু বেশি ঝুঁকে গেছেন। অবশ্য তার মানে এই নয় যে রহস্যময়, পুনঃপাঠে আকর্ষণ করতে পারে এরকম কবিতা তিনি লেখেন না। দিব্যেন্দুর কৃতিত্ব এখানেই যে 'দিব্যেন্দু পালিতের কবিতা' এই হলমার্ক ব্যবহার করেও তিনি অনেক রকমের কবিতা লিখতে পেরেছেন। বৃত্তের মধ্যে কখনও ঘুরপাক খায়নি তাঁর লেখনী। যেমন ধরা যাক তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থের 'আত্মীয়' কবিতাটি
কাল রাত্রে ঝড় এসে ঢুকেছিলো পরিচিত ঘরে।
লোকেশ ছিলো না। তার জর্নালের পাতাক'টি উড়ছে হাওয়ায় ;
সেল্‌ফে যেসব বই ব্যবহৃত, ব্যবহার হবে ব'লে এসেছিলো--সব;

লোকেশ ছিলো না। তার স্বরলিপি লেখা খাতাখানি
রবীন্দ্রনাথের দিকে চোখ চেয়ে খাঁ খাঁ শূন্যতাকে
ঢাকবার ব্যর্থতায় একবার শুধু কেঁপেছিলো।
ধূর্ত টিক্‌টিকি তার বান্ধবীর কাছাকাছি গিয়ে
জ্যোৎস্নার আলোয় কিছু ভয় পেয়ে দূরত্বে পালালো।
পর্দার কাঁপন দেখে মনে হয় যেন কেউ এইমাত্র আসবে এই ঘরে---
মহাত্মতা, কিংবা আরো অনায়াস, পরিচিত নাম।

লোকেশ ছিলো না। তার একপাটি জুতো,
কিংবা পাঞ্জাবির ঝুল একপাশে বেশী কাত হ'য়ে---
স্থির থেকে স্থিরতর হ'য়ে---
সময়ের কাছে গিয়ে অবশেষে নির্জনতা হ'লো।

গায়ের চাদর ফেলে পা-টিপে পা - টিপে
মন্দিরের বেদী থেকে একটি গভীর পাপ আস্তে উঠে এলো।
ফাঁকা একটি ঘর। লোকেশ থাকে সেখানে। সে নেই। রয়েছ একপাটি জুতো, ঝুলছে পাঞ্জাবি, জর্নাল, স্বরলিপি লেখা গানের খাতা। ব্যাচেলারের ঘর? কেমন রাত্রে ঝড় ঢুকল সেই ঘরে? কে মহাত্মতা? গায়ের চাদর ফেলে পা টিপে টিপে উঠে আসছে কে? কেন সে গভীর পাপ? একি অবৈধ প্রণয়ের কবিতা কোন? প্রশ্নের পর প্রশ্ন। একবার পড়ে শান্তি নেই এ কবিতা। ফিরে ফিরে পড়তে হয়। পুনঃ পুনঃ পাঠ। দিব্যেন্দুর শেষ কাব্যগ্রন্থে ('সতর্কবার্তা'), যেখানে সমাজ ও সমকালকে ব্যাখ্যা করতে থাকেন দিব্যেন্দু, ঘটনার প্রতিক্রিয়ার লিখতে থাকেন কবিতা, সেখানেও এরকম রহস্যময় কবিতা তিনি রচনা করেন। 'অন্ধ ঘোড়া' সেরকমই এক কবিতা---

ঠিকানা একই আছে যারা দিয়েছিল তারা নেই---
এই ব্যর্থ কড়া নাড়া এই খুঁজে খুঁজে ফিরে আসা
যেন এক অন্ধ ঘোড়া, ভাঙা গাড়ি,
টানে মুণ্ডহীন গাড়োয়ান।

কারও কি বলার কিছু ছিল না আমাকে! ক্ষুব্ধ হাওয়া
কবে এসে মুছে দেবে সব অঙ্ক, রাস্তারও নাম
সেই অপেক্ষায় আমি চেয়ে দেখি মৃত ঘরবাড়ি
অদৃশ্য জলের মধ্যে দেখে কম্পমান মুখ,
নেই কোনও ছায়া।
হয়তো নিজেরই ভুল এই ভেবে ক্লান্ত পা টেনে
সামনে এগোতে যাব এমন সময়
হঠাৎ কে বলে ওঠে, সাবধান, যেও না ওদিকে--
ওখানে থাকে না কেউ, কিংবা থাকে, ওদিকেশ্মশান।

আমি এস্ত খুঁজে দেখি সেই কণ্ঠ হারিয়েছে স্বর;
খুব দূর দিয়ে শুধু চলে যাচ্ছে অন্ধ ঘোড়া
আর মুণ্ডহীন গাড়োয়ান।

কোন ঠিকানায় কার সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা ছিলে কবির? তারা কোথায়? অন্ধ ঘোড়া আর মুণ্ডহীন গাড়োয়ান নিয়ে যাবে কোথায়? 'দ্য লিসনারস্' কবিতার কথা বারবার মনে আসে এ কবিতাটি পড়ার সময়। সেই একই রহস্যেতর বাতাবরণে মোড়া এ কবিতার শরীর।

অবশ্য সময়ের সঙ্গে সঙ্গে, আগেই বলেছি, দিব্যেন্দুর কবিতায় জায়গা করে নেয় বহু ধরনের চরিত্র, সমাজ, সময়। 'কিছু স্মৃতি কিছু অপমান' প্রকাশের পাঁচ বছর পরে ১৯৮৯ সালে প্রকাশিত হয় 'শব্দ চাই, দাও'। এই কাব্যগ্রন্থেই আমাদের সঙ্গে দেখা হয় ম্যাজিকওলা আর তার সঙ্গিনীর, আটটি অসুখী লোক, অপসৃত খেলোয়াড় - বদলি খেলোয়াড়, আর স্বপ্নসন্ধানী কবির, যে গৌহাটি বেড়াতে গিয়ে ফিরবে না আর। এই সময়কালের মধ্যে দিব্যেন্দুর ভাষা কথা বলার ভাষার প্রায় কাছাকাছি চলে এসেছে। নির্ভার ঝরঝরে সেইভাষায় চারপাশের ঘটনা থেকে তিনি নির্মাণ করছেন কবিতা। রাস্তায় ভেলকি দেখাচ্ছে ম্যাজিকওলা। দিব্যেন্দু কবিতায় ধরে ফেললেন সেই ম্যাজিকওলাকে

ম্যাজিকওলার দু'টি হাত ও
দু'টি পা।
তার সঙ্গীর
নরম গা।

সঙ্গী না, সেই সঙ্গিনী---
ঠাটটমকে রঙ্গিনী।
ডুগডুগিতে হাত বাজিয়ে
চেঁচিয়ে বলে, তফাত যা।

চারপাশের মানুষজনকে নিয়ে লেখা দিব্যেন্দুর এরকম কবিতার সংখ্যা অগণন। কখনও ছন্দে বেঁধেছেন তাঁর অবজারভেশন।কখনও মুক্ত গদ্যে তরতর পাল তুলে এগিয়েছে নৌকো। সেইরকমই একটি কবিতা 'রাজেনবাবু'। 'নির্বাসন, নয় নির্বাচন' কাব্যগ্রন্থের এই কবিতাটি সম্ভবত দিব্যেন্দু পালিতের জনপ্রিয়তম কবিতা। আবৃত্তিকারদের কণ্ঠে শোনা যায় এ

কবিতা। টিভি সিরিয়ালে অর্বাচীন পরিচালকের হাতে ধবস্ত হয়েছে এ কবিতা, আবার একলা মধ্যবিত্তের ধূসর মনখার াপের সাথীও এ কবিতা। জনপ্রিয় কবিতার সঙ্গে প্রকৃত কবিতার কোন বিরোধ নেই এই সত্য যেমন প্রতিষ্ঠা করে এ কবিতা, তেমনই দেখিয়ে দেয় একটি প্রকৃত জনপ্রিয় কবিতা কীভাবে আলাদা হয়ে ওঠে সস্তা জনপ্রিয় কবিতার থেকে।
কেমন কবিতা এই 'রাজেনবাবু'? এই কিছুদিন আগে পর্যন্ত মধ্যবিত্ত পরিবারের প্রায় অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিলেন রাজেনবাবুর া মাঝেমাঝেই আসতেন সন্ধেবেলা। আত্মীয় নন ; বন্ধু, স্বজন। সঙ্কোচের সঙ্গে ওমলেট আর চা খেতে খেতে জুড়তেন হাজ ারো গপ্পো। এই মেজাজেই শু হয় কবিতাটি

রাজেন বাবুর দিনগুলো ছিল
রাতের মতো,
আর রাতগুলো দিন।
আসতেন যখন তখন---
আর প্রয়োজনের অতিরিত্ত জোর দিয়ে
বেল টিপতেন দরজায়

রাজেনবাবুর জন্যেই গভীর মধ্যরাতে
জ্ব'লে উঠতো আমাদের বাড়ির আলো,
হেঁসেল থেকে ভেসে আসতো হল্‌দে কুসুমের গন্ধ---
আর চায়ের চামচ নাড়ার শব্দ।
কার্নিস-পেনো বিড়ালের থাবা-চাটা টের পেয়ে
সশঙ্কিত আকাশে ডানা মেলতো
খোপের পায়রাগুলো

এভাবেই মধ্যবিত্ত গেরস্থালির টুকিটাকি ছবির সাথে সাথে এগোতে থাকে কবিতা। একথা ওকথায় রাজেনবাবু আলাপ
জমান আর কবি জানান
রাজেনবাবু সম্পর্কে আমাদের কোনো
কৌতূহল ছিল না---
না তাঁর আশা সম্পর্কে
না তাঁর চলে যাওয়া সম্পর্কে।
তারপর একসময় আসা বন্ধ হল রাজেনবাবুর। কী হল তাঁর? না, সেটুকু জানার ঔৎসুক্যও দেখাননি কবি। এভাবে শেষ হয় কবিতাটি

তারপর অনেক দিনই আর এলেন না রাজেনবাবু--
চ'লে গেল বছরের পর বছর।
সে-জন্য আমাদের মনে ছিল না কোনো কৌতূহল
কিংবা প্রশ্ন ; এর ওর কাছে
খবর নেওয়া।
শুধু যতিহীন মধ্যরাতের ঘুমে নিরাপদ হ'তে হ'তে
এক-একদিন
ভুলে যাওয়া থেকে ত্রমশ মনে পড়ত,
অনেক অনেকদিন না - আসা লোকটির নাম ছিল
রাজেনবাবু।

যতবার পড়ি, মনে হয়, বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলির একটি এটি। জনপ্রিয় কবিতা অনেক সময়ই জনপ্রিয় হয় চড়া সুরের কারণে। ইংরেজিতে যাকে বলে 'সেন সেশন্যালিজম' তাতে ভর করেই দ্রুত পাঠককে জয় করতে চায় সেরকম কবিতা। দিব্যেন্দুর জনপ্রিয়তম কবিতাটিকে একটি পংক্তিও খুঁজে পাওয়া যাবে না যা সেনসেশন্যাল। আগাগোড়া নীচু সুরে বাঁধা এই কবিতা। দিব্যেন্দুর বৈশিষ্ট্য এটিই। যেখানে তিনি পাঠকের সঙ্গে সরাসরি কমুনিকেট করতে চান সেখানেও তিনি (অনেকটা ব্যক্তি দিব্যেন্দু পালিতের মতেই) সংযত, নিয়ন্ত্রিত। এই সমস্ত কবিতায় দিব্যেন্দুর ক্রোধ আছে, ব্যঙ্গ আছে, বক্রোক্তি আছে---চিৎকার নেই। তাঁর কথা বলার ধরণ নয় ওটা। নীচু স্বরে কবিতা হওয়া সত্ত্বেও 'রাজেনবাবু' যে সরাসরি পাঠকের সঙ্গে কমিউনিকেট করতে পারে তার রহস্য অন্য। আদতে এটি একটি কাহিনী নির্ভর কবিতা। কাহিনীকে বহু বহু কবিতায় ব্যবহার করেছেন দিব্যেন্দু। কখনও কাহিনী লুকিয়ে রেখেছেন কবিতারআলো - আঁধারি শরীরে, কখনও কাহিনীটিই কবিতা। এখানে যেমন। একটি সম্পূর্ণ কাহিনীই যখন কবিতা হয়ে ওঠে তখন পাঠক তারভেতর থেকে পেতে চান আশ্চর্যকে আবিষ্কারের আনন্দ। অধিকাংশ সময়েই দেখা যায় কবিতার শেষ কবি বিদ্যুৎ চমকের মতো বসিয়ে দিচ্ছেন এমন এক পংক্তি যা কবিতাটিকে নিয়ে যাচ্ছে পাহাড় - সব উচচতায়, স্থাপন করছে মাটি থেকে অনেক উঁচুতে। যেমন সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'মেজাজ'। শাশুড়ি আড়ি পেতে শুনতে পান কালো, ধিঙ্গি বউ, কবিতার শেষে খুশিতে ঝলমলিয়ে উঠে স্বামীকে জানাচ্ছে সন্তানের নাম দেবে সে 'আফ্রিকা', কারণ---"কালো মানুষেরা কী কাণ্ডটাই না করছে সেখানে"। না, এরকম চোখ ধাঁধিয়ে দেওয়া কোন পংক্তি দিয়ে শেষ হয় না 'রাজেনবাবু'। অবশ্য চোখ ধাঁধানো শেষ দিব্যেন্দু পালিতের কবিতায় যে নেই তেমনটা নয়। 'গণধর্ষণ' কবিতায় ধর্ষিতা মেয়েটি কীভাবে আমাদের ঔদাসীন্যে কেবলমাত্র সংবাদ হয়ে যায় তা দিব্যেন্দু জানান চাবুকের মতো পংক্তি দিয়ে--- "শুধুই রক্ত ছড়ায় ছড়ায় ভরার ধানের স্বাদ----। এখন টাটকা কালকে বাসী, পরশুতে সংবাদ"। 'রাজেনবাবু'তে এরকম কোন পংক্তি নেই। বরং বিষণ্ণতায় নীচু হয়ে আসে কবির কণ্ঠ। এরকম একটি কবিতা থেকে কোন আশ্চর্য তাহলে পাঠক আবিষ্কার করেন? আসলে কবিতায় আশ্চর্যের আবিষ্কার নানাভাবে হতে পারে। একটি পংক্তি, একটি শব্দ বা দু লাইনের মধ্যবর্তী স্পেসও পাঠকের কাছে খুলে দিতে পারে আশ্চর্যের অর্গল। এই কবিতায় পাঠক আশ্চর্য আবিষ্কার নানাভাবে হতে পারে। এই কবিতায় পাঠক আশ্চর্য আবিষ্কার করেন একটু ভিন্নভাবে। ইংরেজি সাহিত্যের কবি ব্রাউনিংয়ের একটি কবিতা 'ফ্রা লিপ্পোলিপ্পি'। লিপ্পো, যে কি না যাজক কিন্তু ভুলতে পারে না ইন্দ্রিয়ের আহ্বান, চমৎকার এক তত্ত্ব খাড়া করে শিল্পের কাজ কি তা ব্যাখ্যা করতে। আমাদের চেনা জগতের চেনা জিনিস, হাজারবার দেখেছি অচেনা করে তোলা, পুরনোকে নতুন আলো দেওয়া, চেনাকে অচেনা করার তত্ত্ব হাজির করেন রাশিয়ান ফর্মালিস্টরাও। সে তত্ত্বের পোশাকী নাম 'ডি ফ্যামিলিয়ারাইজেশন'। অবশ্য সে তত্ত্বে কবিতার আঙ্গিকে, নির্মাণের ওপর ঝোঁকই বেশি। দিব্যেন্দুর 'রাজেনবাবু' মধ্যবিত্ত পাঠককে তার চিরপরিচিত গেরস্থালিকেই নতুন করে দেখায়। পাঠক আবিষ্কার করেন রাজেনবাবুর মতোই দুলাল - হরেন - যতীনবাবুদের। যাঁদের অনুপস্থিতিই জানান দেয় কী গুত্বপূর্ণ ছিল তাঁদের উপস্থিতি। পাঠক আবিষ্কার করেন এই সত্য, এই আশ্চর্য। চেনা রাজেনবাবু, চেনা গেরস্থালিকে অচেনা করে দেওয়াতেই দিব্যেন্দুর কৃতিত্ব।

অবশ্য দিব্যেন্দু পালিতের সব কাহিনী কবিতাই যে এরকম তা কিন্তু নয়। ব্যক্তিগতভাবে দিব্যেন্দু পালিতের গ্রন্থগুলির মধ্যে আমার প্রিয়তম 'বড় ছেলে ছোট ছেলে'। এই গ্রন্থে আছে এমন অনেকগুলি কবিতা কাহিনী যেখানে সরাসরি ব্যবহৃত হয়েছে। সফল ঔপন্যাসিক দিব্যেন্দু এইসব ক্ষেত্রে কাহিনীকে টানটান করে বেঁধে রেখেছেন কবিতার ধনুকে। 'ভারতবর্ষ' কবিতায় আমরা দেখি আমস্টার্ডামে হোটেলের লবিতে ডাচ তণী লুসি কবিকে জানাচ্ছে তার ভারত ভ্রমণের কথা

'আমি ভারতবর্ষে যাবার আগে
সবাই মানা করেছিল আমাকে।
বলেছিল, যেও না---
কারণ তোমার চুল সোনালি,
কারণ তুমি স্বাস্থ্যবতী
কারণ তুমি সুন্দরী---
ওরা তোমাকে রেপ্ করবে।'

আমি খুব মনোযোগ দিয়ে শুনতে লাগলুম ওর কথা;
আমি খুব মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগলুম বাইরে বৃষ্টি।
লুসি তার তন্ময়তা আরও সুদূর ক'রে বলল,
'কী আশ্চর্য দেশ এই ভারতবর্ষ!
কী সুন্দর এর মানুষেরা!
আমি আর আমার বান্ধবী---
ভেবে দ্যাখো দু'টি সোনালী চুলের সুন্দরী মেয়ে---
দু'মাস ধ'রে ঘুরে বেড়ালাম ভারতবর্ষে
কিন্তু কেউ আমাদের
রেপ্ তো দূরের কথা
গা পর্যন্ত ছুঁলো না!'
বছরখানের আগে চিনে গিয়েছিলেন দিব্যেন্দু পালিত। আবারও তাঁর কবিতার বিষয় হয়ে ওঠে বাংলা জানা চিনা যুবতী সিয়াং আর ভারতবর্ষ, নিদিষ্ট করে বলে বাংলা, বাংলাভাষা। 'কৃত্তিবাসের' সর্বশেষ সংখ্যা (জুলাই - সেপ্টেম্বর ২০০৫) প্রকাশ পেয়েছে সেই কবিতা, 'চিনের দিনলিপি  অক্টোবর ২০০৪'
অবাক লাগছে গত বেশ কিছুক্ষণ
আমি কথা বলেছি শুধু বাংলায়
চপস্টিকে খেতে অসুবিধা হতে পারে ভেবে
সিয়াং আমাকে এনে দিয়েছে কাঁটা - চামচ,
লাঞ্চ টেবিলে আমার পাশে বসতে বসতে বলেছে,
'ইচ্ছে হলে হাত দিয়েও খেতে পারেন---
লজ্জা বোধ করার কিছু নেই।'

আমি বুঝতে পারছি না
কেন আমার চোখে জল আসছে,
কেন আমার গলা বুজে আসছ আবেগে!

কয়েকদিন পরে ফিরতে যাব ভারতে
পশ্চিমবঙ্গে, কলকাতায়
যেখানে মানুষ কথা বলে বাংলায়,
যেখানে মানুষের মাতৃভাষা বাংলা,
আর মাতৃভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার দাবিতে
কিছু মানুষে
রোদ বৃষ্টি ভুলে প্লাকার্ড হাতে
প্রায় নামতে হয় রাস্তায় ....
'বড় ছেলে ছোট ছেলে' কাব্যগ্রন্থের নাম কবিতাটিও একটি অসামান্য কবিতা। সময়, সময়ের ক্ষত, সেই ক্ষতকে ব্যক্তিম নুষের চোখ দিয়ে দেখানোর প্রচেষ্টা এ কবিতায় দিব্যেন্দু একশ শতাংশ সফল। সত্তরের উত্তাল দিনগুলি এই কবিতার বিষয়। মেধার অপচয়, দিক্‌ভ্রষ্ট দর্শনের মতো সিরিয়াস বিষয়গুলিকে সরাসরি স্পর্শ না করে দিব্যেন্দু সন্তান হারানো এক পিতার শূন্যতার অনুভব দিয়ে মাপতে চান উথাপপাতাল সময়টাকে। সেই সঙেঘই দেখান পরের প্রজন্ম কীভাবে কেরিয়ার

সচেতন হয়ে উঠেছে---কোথায় কতটুক পাব এই হিসেবের মাপকাঠিতে তারা বুঝে নিতে চাইছে নতুন শতাব্দী। দেয়ালে ট াঙানো আছে সেই উত্তাল দিনগুলিতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়া বড় ছেলের ছবি, চোখের সামনে ক্যালকুলেটর হাতে ছোট ছেলে

আমি জানি না কেন আমার
ছোট ছেলে বাড়ি ফেরা
আমাকে মনে করিয়ে দেয়
আমাদের সচকিত জেগে ওঠা;
আর
সেই ব্যস্ত কণ্ঠস্বর,
'মা, কিছু খেতে দাও,
এক্ষুনি আবার যেতে হবে।
যদি না ফিরি, ভেবো না---

মাঝখানের স্তব্ধতা আমাকে
এর বেশি দেয় না।
আমার ছোট ছেলে জানে
কার হাত ধ'রে সে
এগিয়ে যাচ্ছে কোনদিকে।
তার খিদে পায় না,
তার রাতগুলোও
সাজানো মঞ্চের মতো উজ্জ্বল হয়ে থাকে
বোতাম - টেপা আলোয়।
এখন আমি অনেক বেশি নির্ভয়;
এখন আমি অনেক কিছুই ভুলে গেছি।

রাতের অবিচ্ছিন্ন নিরাপত্তার মধ্যে
শুধু ওই প্রতিশ্রুতিই
হঠাৎ-হঠাৎ জাগিয়ে দেয় আমাকে---
দেখো, ঠিকই ফিরে আসবো।

এক সন্তান হারানো পিতার বেদনা পাঠকের হৃদয়ে দিব্যেন্দু সঞ্চারিত করেন। কবিতাটির সাফল্যও এখানে। সামাজিক ঘ াত- প্রতিঘাতে শেষ পর্যন্ত বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয় যে, সে তো ব্যক্তিমানুষই। 'বড় ছেলে ছোট ছেলে' কাব্যগ্রন্থে আরও কতগুলি ক াহিনী কবিতাআছে যেখানে বাইরের সমাজ নয়, দিব্যেন্দু তাকান নিজের ছোট পৃথিবীর দিকে---আত্মীয়- স্বজন, মা-স্ত্রীর, স ম্পর্কের দিকে। সেরকম দুটি কবিতা 'আমরা' আর 'জন্মবৃত্তান্ত'। দাম্পত্য সম্পর্ককে পুনরাবিষ্কারের যে নিদাণ চেষ্টা চাল ায় বিবাহিত প্রতিটি দম্পতি 'আমরা' তারই দলিল

আজ আবার আমরা বেরিয়েছি এক সঙ্গে
অনেক দিন পরে
আমার সঙ্গে আমার স্ত্রী
আমার স্ত্রীর পাশে যে-লোকটি
সে যথাযোগ্যভাবে হয়ে ওঠার চেষ্টা করছে

আমার স্ত্রীর স্বামী
যে ভাবে আমার পাশের মহিলাটি
অনেকক্ষণ ধ'রে চেষ্টা করতে করতে
ক্রমশ হয়ে উঠল তার স্বামীর স্ত্রী
এবং এইভাবে
দু'জন দু'জনকে নিয়ে ভাসতে লাগল
আদে

'জন্মবৃত্তান্ত' কবিতাটি দিব্যেন্দু পালিত মাতৃবিয়োগের দিন শ্মশান থেকে ফিরে লেখেন। মা - ছেলের সম্পর্ক নিয়ে রচিত হাজারো কবিতার ভিড়ে কোনওদিন হারিয়ে যাবে না এমন এক কবিতা 'জন্মবৃত্তান্ত'

মা বলত
সেই জ্যোৎস্নায় ফুটফুটে রাতের কথা,
যখন
আমি আসবো ব'লে
চাঁদ ঢুকে পড়েছিল আমাদের কুঁড়ে ঘরে---
আর কোথা থেকে যেন
একটা চক্রধর সাপ
আমারই মাথার পাশ দিয়ে চ'লে গেল
ক্ষমা দেখিয়ে।

মা জানত
মানুষের জন্মের কাহিনী
ঠিক কতটা বললে
সুন্দর হয়।
ঠিক কতটা বললে
সাপের ছোবলেও ঝ'রে পড়ে মধু।

দিব্যেন্দু পালিতও জানেন কতটা বললে সাধারণ কথা, নিত্যদিনের অভিজ্ঞতাও কবিতা হয়ে ওঠে। 'কবিতা রিভিউ'র জুলাই ২০০১ সংখ্যায় এক লেখায় (''আমাদের সময় এবং আমরা'') দিব্যেন্দু লিখেছিলেন

কী লিখব এবং যা লিখব তা কেমন করে লিখব, এই দুটি প্রশ্নে যে কোনও লেখকই কমবেশি চিন্তিত হন। প্রশ্ন দুটির ঠিকঠাক উত্তর পাওয়ার মধ্যেই কিন্তু লেখার সাহিত্য হয়ে ওঠা নির্ভর করে না। সে জন্য দরকার অভিজ্ঞতায় অর্জিত অন্ধকারগুলিকে নিজস্ব অনুভব দিয়ে আলোকিত করা, বুদ্ধি দিয়ে গ্রহণ, বর্জন ও নির্বাসন। এসে যায় আরও নানা প্রশ্ন। একই সময়ে বসবাস করে এবং সেই সময়ের ঘটনা ও ইতিহাসে অভিজ্ঞ হয়েও একজন লেখক যে তাঁর সমকালীন আর একজন বা অন্যান্য লেখকের চেয়ে সর্বতোভাবে আলাদা হয়ে ওঠেন---এই স্বাতন্ত্র্য তিনি অর্জন করেন কীভাবে? কী লিখব, কেমন করে লিখবছাড়াও একটি প্রশ্ন -- অর্থাৎ , কী লিখব না -- কি লেখালেখি সম্পর্কে তাঁর ধারণাকে এমনভাবে পরিশীলিত করে যে তিনি অন্যরকম না হয়ে পারেন না?

কেবল মাত্র ঔপন্যাসিক হিসেবে নয়, একজন কবি হিসেবেও দিব্যেন্দু জানেন বলা যায় কতটুকু--- কী তিনি লিখবেন না। চারপাশের যে ঘটনাপ্রবাহের ভেতর তিনি বেঁচে আছেন, যে অন্ধকার অভিজ্ঞতায় অর্জন করছেন তাকে নিজস্ব অনুভব দিয়ে আলোকিত করে, বুদ্ধি দিয়ে গ্রহণ ও বর্জন করে তিনি নির্মাণ করেন কবিতা। 'কী লিখব না' --এই প্রশ্নের উত্তর তিনি সম্যক জানেন বলেই সহজেই তিনি পারিপার্শ্বিক থেকে খুঁজে পান কবিতা। কল্পনার বানানো জগতের ওপর দিব্যেন্দু পালিতের

কবিতা একেবারেই নির্ভরশীল নয়।

শৈশব থেকে কৈশোরে পা রাখার সময় সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'বোধন' পড়ে আলোড়িত হননি এমন বাঙালি কবিতা প্রেমী দুর্লভ। আবৃত্তিকারদের মুখে মুখে ফেরা এ কবিতার রক্তে কাঁপন জাগানো পংক্তিগুলির আবেদন অনস্বীকার্য। বারো - তেরো বছর বয়সে কী যেতৃপ্তি পেতাম কবিতাটি আবৃত্তি করে! এখন কবিতাটি পড়তে গেলে অসুবিধে হয়। বিশেষত সে সময় ভাল লাগত যে সমস্ত পংক্তি--- যেমন "প্রিয়াকে আমার কেড়েছিস তোরা ভেঙেছিস ঘরবাড়ি / সে কথা কি আমি জীবনে মরণে কখনোও ভুলতে পারি?/ আদিম হিংস্রমানবিকতার যদি আমি কেউ হই / স্বজন হারানো শ্মশানে তোদের চিতা আমি তুলবই" বা "শোন্‌রে মালিক, শোন্‌রে মজুতদার/ ফসলফলানো মাটিতে রোপণ করব তোকে এবার"---এখন কেমন যেন আর্টিফিশিয়াল লাগে। সুকান্তর সিনসিয়ারিটি, তাঁর অনুভবকে এতটুকু খাটো না করেও বলা যায় তাঁর কণ্ঠস্বরকে শ্রমিক কৃষকের কণ্ঠস্বর বলে মেনে নিতে কষ্ট হয়। এখনকার অনেক কবিরাও সমাজের নীচু তলায় মানুষের কথা বলতে গিয়ে সেজে ওঠেন সেইসব মানুষ তাদের কণ্ঠস্বরকেই ধরতে চান নিজেদের লেখায়। কথাটা উঠল এ কারণেই যে দিব্যেন্দু শ্রেণী অবস্থানেই স্থিত, কখনও অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষ। নিজের শ্রেণী অবস্থানের চরিত্রগুলির সঙ্গে দিব্যেন্দু একাত্ম হয়ে গেলেও, ফার্স্ট পার্সন পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে কবিতা নির্মাণ করলেও (যেমন 'বড় ছেলে ছোট ছেলে' কবিতার পিতা ), সাধারণত নীচু তলার মানুষের ক্ষেত্রে নিজের কণ্ঠস্বরকে আরোপিত করেন না চরিত্রগুলির ওপর। ওই চরিত্রগুলি থেকে বরং একটু দূরত্বই বজায় রাখেন তিনি। মধ্যবিত্ত পাঠকের সুবিধে হয় দিব্যেন্দুর এই অবস্থানটিক সঙ্গে একাত্ম হতে। চরিত্রগুলির থেকে প্রয়োজনীয় দূরত্বে দাঁড়িয়ে থাকার ফলে দিব্যেন্দুর অভিজ্ঞতা, অনুভব বড্ড বেশি অথেনটিক হয়ে ওঠে-- একেবারেই আর্টিফিশিয়াল মনে হয় না। যেমন ধরা যাক দু'হাজার পাঁচেই প্রকাশিত 'যারা ভিক্ষা দেয়' কবিতাটির কথা

দু'হাত তফাতে থেকে যে ভিক্ষা করে তার
প্রসারিত হাতে
কুষ্ঠে গলে যাওয়া পুরো দশটি আঙুল
যারা ভিক্ষা দেয় তারা
সেই হাতে দিতে গিয়ে দান
ঘৃণায় পিছিয়ে যায় হাতে দিয়ে
ফিরে যায় দ্রুত
সে ভাবছে দয়াও কি পক্ষপাতে মেলে!
কুষ্ঠরোগী এইসব কিছুই ভাবে না
নিস্প্রভ দুই চোখে সে শুধু তাকিয়ে থাকে
অদৃশ্য আঙুলের দিকে
একদা যেখানে ছিল রত্নখচিত অঙ্গুরীয়
আর করতলে ছিল সৌভাগ্যসূচক সব রেখা।

অসামান্য এই কবিতাটি পড়ে পাঠক চমকে ওঠেন। কুষ্টরোগীটির পয়েন্ট অফ ভিউ দিয়ে কবিতাটি লেখা হয়। দিব্যেন্দু দেখছেন তার প্রতি পথচারীর ঘৃণা আর তারপর জানাচ্ছেন, অনুমান করছেন কুষ্ঠরোগী কী ভাবতে পারে সে কথা। ফাস্ট পার্সন অনুপস্থিত এখানে। কুষ্ঠরোগী এক চরিত্র মাত্র। কবি তাকে দূর থেকে দেখছেন --- বেদনায় ভরে উঠছে তার মন। এই বেদনাকে পাঠকের বানানো মনে হয় না। দিব্যেন্দুর অনুভূতিপ্রবণ মনটি কী সহজেই প্রকাশ পায় ছোট এই কবিতাটির মধ্যে দিয়ে।

আসলে অনুভূতিই তো সব -- তীব্র সংবেদনশীলতাই তো একজন কবির সৃজনের রহস্য। সারাজীবন ধরে দিব্যেন্দু তাই এমনকিছু কবিতা লিখে গেছেন যা অনুভতিময়। স্পর্শ, তার মহিমা, আঙুলে ছোঁয়ানোর জাদুতে দেখা যায় কত গভীর মন, চোখ কীভাবে পড়তে থাকে চোখ তা নিয়ে এমন বিশুদ্ধ লিরিক বাংলা কবিতায় খুব বেশি রচিত হয়নি
হাতে হাতে, মুখে ন্যুব্জ বুলি--

ন'ড়ে ওঠে চম্পক অঙ্গুলি।
ন'ড়ে ওঠে চোখের কাজল।

দেখা যায় বহুদূর তল

তল? না কি জল, শুধু জল!
ক্রমশ বিচ্ছিন্ন ছায়াগুলি।

হাতে হাত! মুখে স্তব্ধ বুলি--
গ'লে যায় চম্পক অঙ্গুলি,
ধুয়ে যায় চোখের কাজল।

হাতে হাত। স্পর্শে নড়ে ওঠে আঁখি পল্লব। প্রথম স্তবকের শেষ লাইনই প্রায় ফিরে আসে শেষ পংক্তি হয়ে। শুধু 'ন'ড়ে ওঠে' জায়গা করে দেয় 'ধুয়ে যায়' কে। ধুয়ে যায়? কে ধুইয়ে দেয়? অশ্রু? আনন্দের? বিষাদের? স্পর্শের? প্রেম কেড়ে নিয়েছে শব্দ--- দিয়েছে অনুভূতি। উদ্বেল সেই অনুভূতিকে ধরতে, প্রতিটি লাইনে 'ল' ধ্বনি ব্যবহার করেন দিব্যেন্দু। বয়ে চলেছে জল -- তীব্র স্রোতধারা নয় ; হৃদয় নিংড়ানো অশ্রু। 'ল' ধ্বনির সুললিত ব্যবহারে কী অনায়াসে কবিতার ভেতরে বেজে ওঠে সেই অশ্রু পতনের শব্দ। এরকমই আর একটি বিশুদ্ধ লিরিক 'উড়ো চিঠি'।
কাজের শেষে বাড়ি ফেরার সময় একলা মানুষ অবশ্যই চোখ রাখে একবার লেটার বক্সের কাঁচে। চিঠি খোঁজে সে। অ াসলে তো চিঠি না, সে খোঁজে অক্ষরের তাপ। হতে পারে সে চিঠি বিষাদের সংবাদ বয়ে আনল, হতে পারে ঝলমলে খুশির খবর। যাই হোক--- শেষমেশ চিঠি তো। একজন মানুষের হাতের স্পর্শে জেগে ওঠা অক্ষর, অনুভব। তাতে তো হ াত বুলিয়েও সুখ। কেউ তো চাইছে কথা বলতে, ভাগ করতে সুখ বা দুঃখ। একলা মানুষ তো তাই খোঁজে যোগাযোগ। প্রয়োজন নেই জানবার, কে পাঠাবে চিঠি। সে যে পাঠিয়েছে চিঠি, যথেষ্ট এই
আসবেই---
একদিন না একদিন--
ঘুম চোখ কচলে নিয়ে দেখবে হঠাৎ
সোনালি রোদ্দুর থেকে উড়ে এসে
পড়েছে মেঝেয়!
হ'তে পারে দুঃখ তার সর্বাঙ্গে জড়ানো
হ'তে পারে শোক--
বিদ্ধ করার আগে ঘাতকের অকম্পিত ছুরি।
হ'তে পারে সুখ এক
কাপাস তুলোর ঢঙে ---এলোমেলো---
আনন্দের ব্যাখ্যা নেই কোনো
যদি দুঃখ হয় তাকে একা রেখো বুকে।
যদি সুখ হয় তার সুগন্ধ ছড়িয়ে দিও--- যেন
বেড়াতে এসেছো একা ভোরবেলা অচেনা বাগানে।
শুধু অনুভব কোরো
যে পাঠালো তার কথা জিজ্ঞেস কোরো না।
দিব্যেন্দু পালিতের কবিতার বহুদিক নিয়ে কথা বললেও আমরা তাঁর কবিতার আঙ্গিক নিয়ে তেমন কিছু বলিনি। কেমন তঁ ার শব্দ ব্যবহার? ছন্দ ব্যবহার? না, এসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করিনি বিশদে। একটা কারণ অবশ্যই যে কবিতার অ

াঙ্গিক নিয়ে তুমুল ভাঙচুরের চেষ্টা বাংলা কবিতায় অনেকেই যেমন করেছেন, দিব্যেন্দু করেননি। হতে পারে হয়তো যে ব্যক্তি দিব্যেন্দুর সংযমও স্থৈর্যই তাঁকে তুমুল ভাঙচুরের পথে যেতে দেয়নি। বাংলা ভাষার সবকটি ছন্দেই তিনি, সাবলীলভাবে লিখেছেন, কিন্তু স্পেকটাকুলার হয়ে ওঠার চেষ্টা করেননি কখনও। তাঁর কিছু কথা বলার আছে। ছন্দকে সেই কথা বলার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেছেন মাত্র। 'কোনোকণ কবিকে' কবিতায় কেবল ভঙ্গি দিয়ে মন ভোলানোর চালাকিকে ঈষৎ ব্যঙ্গ করেই জানান যেন, লেখেন, ''ছন্দে আমি নাইকো ততো দড়''। ব্যঙ্গের কথা যখন উঠলই তখন জানান যাক যে দিব্যেন্দুর সাম্প্রতিক কবিতায় ব্যঙ্গ, কটাক্ষ বিদ্রূপ, একটু বেশিই চোখে পড়ে। সমাজের ক্ষতগুলি নিয়ে, পৃথিবীর একীকরণ নিয়ে চিৎকার না করেও দিব্যেন্দু সরব। 'কৃত্তিবাসের' ওই সাক্ষাৎকারে তাই হয়তো তিনি বলেছেন

তবে স্বভাব - কবি হওয়ার দিন চলে গেছে--- সুগার - কোটেড কবিতার দিনও চলে গেছে। বাইরের জগত প্রতিদিনই আম াদের এতরকম অভিজ্ঞতার সামনে দাঁড় করাচ্ছে--- গত কয়েক বছরে প্রচারমাধ্যমের বিপুল বিবর্তনের ফলে অনেকটা-- নিকট বিশ্ব থেকেআন্তর্জাতিক বিশ্বে আমরা পৌঁছে যাচ্ছি অত্যন্ত দ্রুত এবং বিভিন্ন ঘটনার অভিঘাতে এতভাবে বদলে যাচ্ছে আমাদের প্রতিত্রিয়া যে নিতান্তই প্রেম, প্রকৃতি ও তথাকথিত রোমান্টিকতায় আচ্ছন্ন থাকা কোনো সৃজনশীল ব্যক্তি পক্ষেই এখন আর সম্ভব নয়, সমসাময়িক বাস্তব আর চলমান ইতিহাস থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকা থাকা প্রায় অসম্ভব।

সাম্প্রতিক সময়ে দিব্যেন্দু তাই ইরাকের যুদ্ধ, গুজরাটের দাঙ্গা, মন্ত্রীদের খেলো বক্তৃতা, নির্বাচনী প্রচারের বিলি হওয়া শা ড়িকুড়োতে গিয়ে মারা যাওয়া মহিলা, যৌনকর্মীদের নিয়ে তৈরি হওয়া ছবির মুক্তি --এইসব তেতো বিষয় নিয়ে কবিতা লিখেছেন। এই তেতো কবিতাগুলিতে দিব্যেন্দুর শব্দ ব্যবহারও ঈষৎ তেতো। ইংরেজি কবিতায় যাকে বলা হয় 'ব্যান্টার' তাও রয়েছে বিস্তর। 'গর বিষয়ে' কবিতায় বক্তৃতা দিচ্ছেন এক জননেতা। বলছেন অদ্ভুত এই সময় যখন একই সঙ্গে চলছে জেটবিমান আর গর গাড়ি। বলে, তিনিথামছেন -- অপেক্ষা করছেন অভ্যস্ত হয়ে যাওয়া হাততালি কুড়োনোর জন্য। কিন্তু --

... হাততালি দিল না কেউই।
বরং বাড়তে লাগল ফিসফাস আর
এ ওকে দেখালো আঙুল
তিন, পাঁচ, আটের ইশারা।

শুধু একজন বেয়াড়া শ্রোতা
পিছন থেকে বলে উঠল,
'গর গাড়ি নিয়ে এইসব কথা
আপনি আগেও বলেছেন অনেকবার---
এবার বরং গর বিষয়ে কিছু বলুন।

এই ঠাট্টা, এই ঝাঁক দিব্যেন্দুর কবিতায় অবশ্য নতুন সংযোজন নয়। আমরা তো আগেই বলেছি দিব্যেন্দু পালিতের কবিত ায়বিবর্তন সম্পূর্ণ ধারাবাহিক না হলেও, একেবারে সংযোগহীনও নয়। ১৯৮৬ তে প্রকাশিত ''নির্বাসন, নয় নির্বাচন'' ক াব্যগ্রন্থের 'শুয়োর' কবিতায় দিব্যেন্দু লিখেছিলেন

শুয়োর বলতে ঠিক কী বোঝায়
আমরা কেউই জানি না।
কিন্তু তার ঘোরাফেরা মানুষের মধ্যে
মানুষেরই এলাকায়---
অন্য অনেক মানুষও শুয়োরের সঙ্গে।

তারপর যখন কোনো মানুষকে আমরা শুয়োর বলি
তখনও গোলমাল হয়ে যায় ব্যাখ্যায়।

শুয়োর অবশ্য এসব কোনো খবরই রাখে না।
ভুল বা ঠিক
মানুষের অস্তিত্ব সম্পর্কে কোনো ধারণাই তার নেই।
প্রতিশোধ হিসেবে শুয়োরকেও যে ডাকা যায় মানুষ নামে
এ-ভাবনা ভাববার মতো বুদ্ধি বা সংগঠন
কোনোটাই তার নেই।
থাকলে,
নিজের দাঁতে যে অনেক বেশি ধার
এটাও সে টের পেত।
ফর্মের দিক থেকে খুবই উল্লেখযোগ্য 'মানুষ যেভাবে কথা বলে'। সমাজের নানাস্তরের মানুষের কথোপকথন ছন্দে বেঁধে দিব্যেন্দু নির্মাণ করেছেন এ কবিতার শরীর। দীর্ঘ এই কবিতার দ্বিতীয় টুকরোটি শু হয় এভাবে
'চললেন কোথায় এই ভোরে---
রবিবার বলে কিছু নেই!'

'রবিবার বলেই তো এই।
যাবো একটু হালিশহরে
তদারকি করতে জমিখানা।'
'ও তাই বলুন! পোঁদে আঠা
লেগে গেছে এরই মধ্যে!
বাড়ি করছেন তাহলে---!

'সস্তায় পেলাম তিনকাঠা।
বাড়ি? হেঁঃ, সে তিন বাঁও জলে।'
শব্দ ব্যবহারে এ কবিতায় দিব্যেন্দু যতটা সাহসী--- ততটা অন্যত্র নন। এটি ব্যতিত্রমের দৃষ্টান্ত। যদিও, সেই কবে, প্রথম ক াব্যগ্রন্থেই তিনি লিখেছিলেন--- 'থাক, গ্যাম্বেল ক'রো না' -- তবু কবিতায় শব্দ ব্যবহার নিয়ে একটা হেস্তনেস্ত করবার শপথ তিনি কোনদিনই নেননি। চূড়ান্ত কোনো অবস্থান গ্রহণের থেকে একটু দূরেই থেকেছেন তিনি।

বিশাল এই বাংলা কবিতার ভুবনে একজন কবির অবস্থান চিহিত করা একটি দুরূহ ও বিপজ্জনক কাজ। বাংলা কবিতার এক সামান্য কর্মী হিসেবে সে দায়িত্বও আমি নেব না। শুধু এই লেখা তৈরি করতে গিয়ে যখন ফিরে পড়ছিলাম দিব্যেন্দু পা লিতের কবিতা, মনে হচ্ছিল কী সেই জিনিস যার জন্য ভবিষ্যতের পাঠক বারবার পড়তে বাধ্য হবেন দিব্যন্দু পালিতের কবিতা? কী সেই জিনিস যা কবি দিব্যেন্দু পালিত আর ঔপন্যাসিক দিব্যেন্দু পালিতের মধ্যেও যাতায়াত, আদানপ্রদান সহজ করেছে? সে জিনিস মমতা । স্পেকটাকুলার অনেক কবিরই যা নেই--- দিব্যেন্দুর তা আছে--- মমতা। এই ভুলে -- ক্লেদে ভরা পৃথিবীর পানে বড় মমতার তাকান দিব্যেন্দু। তাঁর মমতামাখা দৃষ্টি ছুঁয়ে যায় পাঠককে। 'রোগিনী যা পায়' কবিতায় হাসপাতালের কেবিনে কী যত্নই না পায় রোগিনী! এত যন্ত কখনও আগে পায়নি সে তার প্রতিদিনের জীবনয াপনে সঙ্গী ক্লিন্ন মানুষগুলির থেকে। তবু সকাল থেকে কেবিনে বন্দি মেয়েটি অপেক্ষা করে। বিকেলের জন্য। অপেক্ষা করে সেই মানুষগুলির জন্যই
ঘুমের মধ্যে না-ঘুমোনোর অস্বস্তিতে তবু
ছটফট করে সে, কখন

বিকেল হবে, কখন আসবে
যারা অনেক খারাপ আছে সেইসব
ঈর্ষা - জাগানো মানুষ
এই মমতা তাঁর সারাজীবনের লেখালেখিতে ফল্গুর মতো বইতে থাকে--- সংবেদী পাঠকের সঙ্গে সেই গোপন স্রোতের দেখা হলেই ভিজে যায় মানব জমিন। তা আর পতিত থাকে না। খুব কম শিল্পীর এই মমতা করায়ত্ত। ত্রাফট দিয়ে, স্কিল দিয়ে চোখ ধাঁধিয়ে দেওয়া যত সহজ, মানবজীবন চাষ তত সহজ নয়। দিব্যেন্দু এই কঠিন কাজটা বারবার করেছেন, করে চলেছেন। ১৯৮৫ সালে শৈশব - কৈশোরের ভাগলপুরের পুজোর স্মৃতি নিয়ে ছোট্ট একটি গদ্য লিখেছিলেন দিব্যেন্দু 'হারানো পায়ের স্মৃতি'। সংস্কৃত পণ্ডিত, নিজের পিতার সঙ্গেই সে লেখায় একটি অংশে দিব্যেন্দু স্মরণ করেছেন পিতার বন্ধু উকিল অনাথ বাবুর কথা। এ লেখা শেষ করার মুহূর্তে ্য ওইছোট্ট গদ্যটি থেকে সেই অংশটি উদ্ধৃত করার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না
মক্কেল পেতেন না বলে লোকে ক্ষ্যাপাত অনাথবাবু উকিলকে। পিতৃবন্ধু এই মানুষটি তবু রংচটা কালো কোট গায়ে, ময়লা ফুলপ্যান্ট আর তালিমারা জুতো পরে মাথা নিচু করে রোজই হেঁটে যেতেন কাছারি দিকে। ফিরতেন ও তেমনি বেলা বয়ে যাওয়া অভাবী শূণ্যতা নিয়ে। কেমন যে ভয় - পাওয়া চেহারা; ভয়ই পেতেন। একাদশী দ্বাদশীতে রাস্তায় হঠাৎ দেখা হয়ে গেলে অভ্যাসবশত প্রণাম করতে হত তাঁকে। ভয় - পাওয়া মুখে হাসি ফুটত তখনই। 'রাস্তায় প্রণাম করছ---' উক্তি নিজেই সামলে নিতে তখুনি। কাঁচুমাচু মুখে বলতেন, 'রাস্তাই ভালো, কী বলো! প্রাণ ভরে আশীর্বাদ করছি, কী বলো!'

একদিন খবর পেলাম, রেললাইন পার হতে গিয়ে ট্রেনে কাটা পড়েছেন অনাথবাবু। দুর্ঘটনা না আত্মহত্যা-- বোঝা গেল না কিছুই। কিন্তু আজ এত বছর পরেও তাঁর সেই তালিমারা জুতো দুটি লেগে আছে চোখে। পুজো এলেই মনে পড়ে যায়। দুঃখী মানুষটি, নিজের সম্পর্কে অবিশ্বাস কাউকে আশীর্বাদ করার মুহূর্তেও নিশ্চিত করতে পারত না তাঁকে।

সত্যিই, সারা জীবন ধরে দিব্যেন্দু পালিত হৃদয় উজাড় করে দিয়ে এঁকে চলেছেন ই সব দুঃখী মানুষগুলিকে। আমরা কি ভুলে যেতে পারি 'মনে রেখো' কবিতায় একটি কবিতা লিখে মাত্র ত্রিরিশটা টাকা পাওয়া কবি কী গভীর আস্তা থেকে লিখেছিলেন--- 'মনে রেখো, কবিদের চোখ থাকে বুকে'?



সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com